আসুন আল্লাহর সৈনিক হই

অধ্যাপক গোলাম আযম

আসুন আল্লাহর সৈনিক হই

অধ্যাপক গোলাম আযম

আল আযামী প্রকাশনী

আসুন আল্লাহর সৈনিক হই
অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশনায়

আল আযমী পাবলিকেশন্স

১১৯/২ কাজী অফিসলেন

বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী- ২০০২

অষ্টম প্রকাশ
মে- ২০০৬

স্বত্ব ঃ লেখক

শব্দ সংযোজন ও তত্ত্বাবধানে
তাসনিম কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
১৭১ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন-০১৭১৫৮১২৫৫

প্রচ্ছদ
ওয়ার্ল্ড কালার গ্রাফিক্স. ঢাকা

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা মাত্র

এ পুস্তিকার পটভূমি

মুসলিম জনসংখ্যার সকলে নামায রোযা না করলেও নামাযী ও রোযাদারদের সংখ্যা কম নয়। কোরআন ও হাদীস মুতাবেক নামায-রোযার মাধ্যমে যে গুণাবলী সৃষ্টি হওয়া উচিত তা তাদের মধ্যে দেখা যায় না কেন? যদি ঐ সব গুণাবলী সৃষ্টি হতো তাহলে নামাযী ও রোযাদারদের সংখ্যা হয়তো আরও বেড়ে যেত।

এ প্রশ্নের জওয়াব দেবার উদ্দেশ্যেই এ পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে। এ বছর (২০০১) কয়েকটি ইফতার মাহফিলে এ বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এত অল্প সময়ে এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া সম্ভব হয়নি। তাই পুস্তিকার মাধ্যমে বিষয়টিকে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

এ আশা নিয়েই বইটি রচনা করেছি যে যারা নামায রোযা করেন তাদের অন্তরে এর আবেদন সাড়া জাগাবে, যারা নামায রোযায় অনিয়মিত তারা নিয়মিত হতে উদ্বুদ্ধ হবেন এবং যারা নামায-রোযায় অবহেলা করলেও মুসলিম চেতনার অধিকারী তারা আল্লাহর সৈনিক হবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নামায রোযায় অভ্যস্ত হবেন।

আল্লাহপাক আমার এ বিরাট আশা পূরণ করুন। আমীন।

২৭শে রমযান, ১৪২২ হি;
১৩ ডিসেম্বর, ২০০১ইং

গোলাম আযম
মগবাজার, ঢাকা।

বিষয়সূচী

১. ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি ৫

২. এ পাঁচটির হাকীকত চর্চা ৫

৩. স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হবার যুগে ৬

৪. নামায-রোযার উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছেনা কেন? ৭

৫. নামায-রোযার উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার মূল কারণ ৭

৬. নবীগণের দাওয়াত কী? ৮

৭. নেতাদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া ৯

৮. আবু জাহ্‌লরা নবীর দাওয়াত সঠিকভাবে বুঝেছিল ১০

৯. নবীর দায়িত্ব কী? ১০

১০. নবীর বিরোধী কারা? ১১

১১. নবীর প্রতি ঈমানদারদের দায়িত্ব কী? ১২

১২. নামায-রোযা কাদের জন্য? ১২

১৩. একটি বাস্তব উদাহরণ ১৪

১৪. আল্লাহ ও শয়তানের বাহিনী ১৫

১৫. আসুন আল্লাহর সৈনিক হই এবং আল্লাহর বাহিনী গড়ে তুলি ১৬

ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم : بُنِىَ الاِسْلاَمُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত এ বিখ্যাত হাদীসটি সবচেয়ে সহীহ্ হাদীস সমূহের মধ্যে গণ্য। যে সব হাদীস বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে একইভাবে বর্ণিত সে সব হাদীস "মুত্তাফাকুন আলাইহি" নামে চিহ্নিত। অর্থাৎ এ হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম সহীহ্ হাদীস হিসাবে একমত। তাই সর্বসম্মতভাবে এটা সহীহ্।

অনুবাদ ঃ ইসলাম পাঁচটি জিনিষের উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ (১) এ সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোন হুকুমকর্তা মনিব নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর দাস ও রসূল, (২) নামায কায়েম করা, (৩) যাকাত দেয়া (৪) হজ্জ , (৫) রমাদানের রোযা।

সাধারণভাবে এ ৫টি বিষয়কে "কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত"- এ ক্রম অনুযায়ী সবাই বলে থাকে। অথচ হাদীসের ক্রম হচ্ছে কালেমা, নামায, যাকাত, হজ্জ ও রোযা। কুরআনেও নামাযের সাথেই যাকাতের উল্লেখ বারবার করা হয়েছে।

সম্ভবতঃ নামায ও রোযা এক সাথে এবং হজ্জ ও যাকাত একসাথে উল্লেখ করার রেওয়াজ এ কারণেই চালু হয়েছে যে, কালেমার উপর যারাই ঈমান আনে তাদের সবার উপরই নামায ও রোযা ফরয। হজ্জ ও যাকাত সবার উপর ফরয নয়, শুধু ধনীদের উপর ফরয।

এ পাঁচটির হাকীকত চর্চা

জন্মসূত্রে মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যারা নামায-রোযার ধার ধারেনা তাদের কথা তো আলাদাই। যারা নামায-রোযাকে করণীয় দায়িত্ব বলে স্বীকার করে এবং নিয়মিত বা অনিয়মিত হলেও আদায় করে তাদের মধ্যেও এসবের হাকীকত বা তাৎপর্যের চর্চা এক সময় ছিল না বললেই চলে। তারা কালেমাকে একটি মন্ত্র হিসাবে উচ্চারণ করত এবং নামায ও রোযাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সামাজিক প্রথা হিসাবে পালন করত। কালেমার অর্থ হিসাবে বড় জোর এটুকু জানত যে "আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল"। এ মন্ত্রটির আসল মর্ম নিয়ে চর্চা হত না। তেমনিভাবে নামায ও রোযার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তেমন চেতনা ছিল না।

শুধু সাধারণ মুসলমানদের কথাই নয়, আলেম সমাজেও কালেমার বিপ্লবী তাৎপর্য এবং নামায-রোযার হাকীকত সম্পর্কে তেমন চর্চা ছিল না। যদি থাকত তাহলে জুময়ার জামায়াতে এবং ওয়াজ মাহফিলে তাদের বক্তৃতা থেকে সবাই এ বিষয়ে জানতে পারত। দুশ বছর ইংরেজের শাসনামলে মুসলমানদের ঈমানটুকু বাঁচিয়ে রাখার জন্য আলেম

সমাজ যে বিরাট খেদমত করেছেন তা করা না হলে ইসলামের নামটুকুও মুছে যেত। মুসলমানদের নিকট থেকে চাঁদা তুলে আলেমগণ মক্তব ও মাদ্রাসার মাধ্যমে কুরআন ও হাদীসকে হেফাজত করার যে মহান দায়িত্ব পালন করেছেন সে জন্য তাদের নিকট মুসলিম জাতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

ইসলামের সে মহা দুর্দিনেও সাইয়েদ আহমদ বেরলভী (রঃ) ও মাওলানা ইসমাইল (রঃ) এর নেতৃত্বে সীমান্ত প্রদেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়েছিল। কিন্তু ১৮৩১ সালে বালাকোটের ময়দানে তাদের শাহাদাতের পর এবং ১৮৫৭ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর গোটা উপ-মহাদেশে ইংরেজদের রাজনৈতিক গোলামী ও ইংরেজদের দোসর হিন্দুদের অর্থনৈতিক গোলামীর অন্ধকার যুগে আলেম সমাজ ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিরাট অবদান রেখেছেন। কালেমার বিপ্লবী দাওয়াত ও নামায-রোযার হাকীকত সম্পর্কে ঐ সময় তেমন চর্চা না থাকার জন্য তাদেরকে দোষ দেয়া যায় না।

স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হবার যুগে

বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উপমহাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন বিশ শতকের চল্লিশ দশকের শুরুতেই জোরদার হয়। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। সে যুদ্ধে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সমর্থনের বিনিময়ে যুদ্ধের পর স্বাধীনতা দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে বৃটিশ সরকার বাধ্য হয়। ঐ চল্লিশের দশকেই মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর নেতৃত্বে ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন গড়ে উঠে। এ আন্দোলনের মাধ্যমেই উপমহাদেশে কালেমার বিপ্লবী দাওয়াত ও নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাতের হাকীকত চর্চা নতুন করে শুরু হয়।

১৯৫০ সালের শুরুতে আমি তাবলীগ জামায়াতে শরীক হয়ে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত কালেমা-নামায-রোযার চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলাম। হিন্দুস্থান ও তদানিন্তন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বহু বড় বড় আলেমের সংস্পর্শে আসারও সুযোগ পেয়েছি। ১৯৪৫ সালে নেযামী ইসলাম পার্টির প্রতিষ্ঠাতাগণের বক্তব্যও শুনেছি। কালেমা ও নামায-রোযা সম্বন্ধে তাঁদের লিখিত বা প্রচারিত বই ছিল কিনা জানি না।

১৯৫২ সালের শেষদিকে তমদ্দুন মসলিসে যোগদানের পর কালেমার বিপ্লবী ধারণা প্রথম পেলাম। তবে সেখানেও নামায-রোযার হাকীকত সম্পর্কে কোন ধারণা পাইনি। ১৯৫৪ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দেবার পর কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও জিহাদ সম্পর্কে এমন সুস্পষ্ট ধারণা পেলাম যা আমাকে অভিভূত ও উৎফুল্ল করল এবং এ সবের দাওয়াতে আত্মনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করল।

আলেম পরিবারে আমার জন্ম। নানার বংশও বিখ্যাত পীরের খান্দান। কঠোর ধর্মীয় পরিবেশেই বেড়ে উঠেছি। এদেশের বিখ্যাত হাক্কানী আলেম মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর (রঃ) সংস্পর্শে এসে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর (রঃ) ওয়ায ও লেখা বই-এর বাংলা অনুবাদ পড়ে ইসলামকে একটি উন্নত ও অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ধর্ম হিসাবে মযবুত ধারণাই পেয়েছিলাম।

ইসলাম যে মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্য একমাত্র পূর্ণাংগ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান, রাসূল (সাঃ) এর দাওয়াত যে মানব রচিত বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দাওয়াত, কালেমা তাইয়েবা যে সমাজ-বিপ্লবের ডাক এবং নামায- রোযা যে বিপ্লবীদের জীবন গড়ার কর্মসূচী- এ সব কথা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর রচিত সাহিত্য থেকেই বুঝতে পেরেছি।

নামায রোযার উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছেনা কেন?

আল্লাহ তায়ালা সূরা আনকাবুতের ৪৫ নং আয়াতে নামায সম্পর্কে বলেন,

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. (عنكبوة : ٤٥)

"নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও মন্দ থেকে বিরত রাখে।" যারা নামায পড়েন তাদের মধ্যে কি নামাযের এ উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে?

সূরা আল বাকারার ১৮৩ নং আয়াতে আল্লাহ পাক রোযার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَاكُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

"হে ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের উপর রোযা ধার্য করা হল যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরও করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়ার গুণ হাসিল করতে পার।"

যারা রোযা রাখেন তাদের জীবনে কি রোযার এ উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে?

নামায ও রোযার উদ্দেশ্য নামাযী ও রোযাদারদের মধ্যে যথাযথ সফল হবার দাবী কি সত্যি আমরা করতে সাহস পাই? যদি না পাই তাহলে এর কারণ তালাশ করা কি প্রয়োজন নয়?

নামায-রোযার উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার মূল কারণ

নবীগণের বিপ্লবী দাওয়াত সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করার পরই আমি উপলব্ধি করি যে ইসলামের ৫টি বুনিয়াদের প্রথমটিই সাধারণ নামাযী ও রোযাদারগণের বোধগম্য হয়নি।

আশাহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে যারা নবীর দাওয়াত কবুল করেছেন সে দাওয়াত সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকার কারণেই মুসলিম জাতির এ দুর্দশা।

সূরা আল-আ'রাফের ৮ম রুকু থেকে ১০ম রুকু পর্যন্ত এবং সূরা হূদের ৫ম ও ৬ষ্ঠ রুকুতে কয়েকজন নবীর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে তারা সবাই একই দাওয়াত দিয়েছেন। যে ভাষায় তারা জনগণের নিকট দাওয়াত পেশ করেছেন তা হলো ঃ

يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ.

"হে আমার দেশবাসী! একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন হুকুমকর্তা নেই।"

আমাদের সমাজে এ বিপ্লবী আয়াতটির অর্থ এমন সংকীর্ণ অর্থে প্রচলিত যে আসল অর্থ বুঝা সম্ভবই হয় না। এ আয়াতের প্রচলিত অনুবাদ হল ঃ "হে আমার কাওম, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মাবুদ নেই।"

এ অনুবাদে ইবাদত ও মাবুদ শব্দ দুটোর ভুল ও সংকীর্ণ অর্থ বুঝান হয় বলেই সঠিক অর্থ হারিয়ে যায়। এ শব্দ দুটোর আসল অর্থ না জানার কারণেই আমরা বিপদে পড়েছি।

ইবাদত ও মাবুদ শব্দ দুটোর মূল হল আবদ শব্দ। আবদ عَبْد মানে দাস, ইবাদত মানে দাসত্ব এবং মাবুদ মানে মনিব-যার দাসত্ব করা হয়। মনিব হুকুম করে, আর দাস ঐ হুকুম পালন করে। দাস যা করে তা-ই দাসত্ব। দাসত্ব করাই দাসের দায়িত্ব।

আমাদের সমাজে ইবাদতের অর্থ অত্যন্ত সংকীর্ণ। নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত, তাস্‌বীহ-তিলাওয়াত, যিক্‌র-আযকারকেই ইবাদত মনে করা হয়। দুনিয়ার অন্যান্য দায়িত্ব পালনকে দ্বীনদারী মনে করা হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্য, বিয়ে-শাদী, সন্তান-পালন, ইত্যাদি যা মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে করতেই হয় সে সবকে দুনিয়াদারী মনে করা হয়। এ অর্থ যে মারাত্মক ভুল তা নিম্ন আয়াত থেকেই স্পষ্ট হয়।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ. (الذاريات : ٥٦)

"আমি জিন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদত করার জন্য পয়দা করেছি।" সূরা আয্‌যারিয়াত ঃ ৫৬ আয়াত

ইবাদতের অর্থ যদি ঐ কয়টি কাজই হয় তাহলে মানুষের দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য আর যা কিছু করতে হয় তা করা কি নিষেধ? আল্লাহ্ কি এমন অবাস্তব কথা বলতে পারেন? তাই ইবাদতের ঐ সংকীর্ণ অর্থ একেবারেই ভুল এবং মারাত্মক ভুল।

ইবাদত মানে মনিবের হুকুম পালন করা। আল্লাহর দেয়া বিধান মোতাবেক দুনিয়ার সব কিছু করাই ইবাদত। আল্লাহর হুকুম অমান্য করে অসময়ে নামায-রোযা করলে কি ইবাদত হবে? হারাম সময়ে নামায পড়লে এবং ঈদের দিন রোযা রাখলে কি ইবাদত হবে? আল্লাহর আদেশ পালন করাই ইবাদত। শরীয়ত মতো কাজ করলে দুনিয়ার সব কাজই ইবাদত।

রাসূল (সাঃ) মানুষকে দুনিয়া ত্যাগ করা শিক্ষা দেননি। মানুষকে বৈরাগী ও সন্নাসী বানাতে চাননি। দুনিয়াদারীর সব কাজকে তিনি দ্বীনদারীতে পরিণত করা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি যা করেছেন তা সবই দ্বীনদারী। তাঁর আয়-রোযগার করা, বিয়ে-শাদী করা, ব্যবসা-বাণিজ্য করা, দেশ শাসন করা ইত্যাদি যেহেতু আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী করেছেন সেহেতু এ সবই ইবাদত। রাসূল (সাঃ) এর শিক্ষা অনুযায়ী চললে সব কিছুই দ্বীনদারী। মুমিনের জীবনের সবটুকুই দ্বীনদারী ও ইবাদত। দুনিয়াদারীকে দ্বীনদারীতে রূপান্তরিত করার জন্যই নবীগণ শিক্ষা দিয়েছেন।

নবীগণের দাওয়াত কী?

ইবাদতের সঠিক অর্থ বুঝলে নবীগণের দাওয়াতের সঠিক মর্ম বুঝা সহজ। কুরআনে কয়েকজন নবীর নাম উল্লেখ করে তাদের পক্ষ থেকে নিজ নিজ দেশবাসীকে যে দাওয়াত দিয়েছেন তার ভাষা একই। এ দ্বারা মক্কাবাসীদেরকে বুঝান হয়েছে যে মুহাম্মদ (সাঃ) কোন নতুন দাওয়াত নিয়ে আসেননি। যুগে যুগে নবী রাসূলগণ যে দাওয়াত দিয়ে গেছেন সে একই দাওয়াত তিনি দিচ্ছেন।

"হে আমার দেশবাসী" একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন হুকুমদাতা মনিব নেই।"

এর সহজ সরল অর্থ এই যে, হে মানুষ তোমাদের উপর হুকুম দেবার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। সূরা আল-আরাফের ৫৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

"জেনে রাখ সৃষ্টি যার হুকুম তারই।" أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ.

যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর হুকুমই সবাইকে মানতে হবে। আবু জাহ্‌ল, আবু লাহাব, আবু সুফিয়ানরা অন্যদের মতোই মানুষ। তাদের মনগড়া বিধান কেউ মেনে চলতে বাধ্য নয়। সবাই এক আল্লাহর গোলাম। কোন মানুষের উপর অন্য কোন মানুষের মনগড়া হুকুম চাপিয়ে দেবার অধিকার নেই। সন্তানের উপর পিতার এবং জনগণের উপর সরকারের হুকুম দেবার অধিকারও নিরংকুশ নয়। তারা আল্লাহর হুকুমের বিরোধী হুকুম করলে তা অবশ্যই অমান্য করতে হবে। নিরংকুশ হুকুমকর্তা একমাত্র আল্লাহ।

আল্লাহকে একমাত্র হুকুমকর্তা মনিব হিসেবে মানার দাওয়াতই নবীগণ দিয়েছেন। আসল মনিবের হুকুমের বিপরীত না হলে অন্যান্য হুকুমদাতাদের হুকুম মানা যাবে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "স্রষ্টার হুকুম অমান্য করে সৃষ্টি জগতে কারো হুকুম মানা চলবে না।"

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

নেতাদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া

সূরা আল আ'রাফ ও সূরা হূদের যে সব রুকুতে নবীগণের নাম উল্লেখ করে তাঁদের দাওয়াত পেশ করা হয়েছে যে সব রুকুতেই বিরোধীদেরকে কাওমের নেতা বলে বলা হয়েছে। প্রত্যেক মানব সমাজেই কতক লোক নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করে এবং সমাজ তাদের হুকুম মেনে চলে। এ নেতৃত্ব ব্যাপক। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বের মধ্যে সমন্বয় থাকে। তাদের নেতৃত্বে যে সমাজ ব্যবস্থা চালু থাকে তাতে স্বাভাবিক কারণেই নেতাদের স্বার্থ প্রাধান্য পায়। তারাই দেশের জন্য আইন কানুন ও বিধি বিধান তৈরী করে। জনগণের যত দোহাই-ই দেয়া হোক নেতৃবৃন্দের গোষ্ঠিগত স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা সেখানে নিশ্চিতই থাকে।

তাদের কায়েম করা সমাজ ব্যবস্থা চালু থাকলেই তাদের স্বার্থ বহাল থাকে। এটাকে আধুনিক পরিভাষায় Vested Interest বলা হয়। এরই সার্থক অনুবাদ কায়েমী স্বার্থ। অর্থাৎ এ সমাজ ব্যবস্থা কায়েম থাকলেই তাদের স্বার্থ বহাল থাকে।

নবীগণের দাওয়াত এ কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহের ডাক। নবীগণ জনগণকে বলছেন, "তোমরা একমাত্র আল্লাহর হুকুম মেনে চল। কারণ তোমাদের উপর হুকুম দেবার অধিকার আর কারো নেই। নমরূদ, ফিরআউন ও আবু জাহ্‌লরা তোমাদের মতোই মানুষ। তোমরা তাদের মনগড়া হুকুম মানতে রাযী হবে কেন? সবাইকে শুধু আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে হবে। আল্লাহই একমাত্র নিরপেক্ষ আর কেউ নিরপেক্ষ নয়। আল্লাহর হুকুমই নিস্বার্থভাবে সবার অধিকার বহাল করতে পারে। আল্লাহর হুকুমই সবার প্রতি সমান সুবিচার করতে সক্ষম"।

নবীর এ দাওয়াত সরাসরি কায়েমী স্বার্থকে আঘাত করে। এ কারণেই সকল নবীর যুগেই কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারীরা এ দাওয়াতের বিরোধিতা করেছে। নবীর দাওয়াত প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা উৎখাত করার ডাক এবং আল্লাহর দাসত্বের ভিত্তিতে নতুন সমাজ কায়েমের আহ্বান।

আবু জাহ্‌লরা নবীর দাওয়াত সঠিকভাবে বুঝেছিল

আবু জাহ্‌ল ও আবু লাহাবরা নবীর দাওয়াতকে শুধু ধর্মীয় দাওয়াত মনে করলে এমন বিরোধিতা করত না। আরবে ঐ সময় ইহুদী ও খৃষ্টধর্ম ছাড়াও মূর্তি পূজা, অগ্নিপূজা ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্ম চালু ছিল। মুহাম্মদ (সাঃ) যদি নতুন একটি ধর্ম প্রবর্তন করতে চান বলে তারা মনে করত তাহলে এমন চরম দুশমনী করা প্রয়োজন মনে করত না।

৪০ বছর বয়স পর্যন্ত যে মানুষটি মক্কায় ছোট থেকে বড় হয়েছেন, সবাই যাকে সেরা মানুষ হিসাবে স্বীকার করে, যার আচরণে মক্কাবাসী তাঁকে আল আমীন (সেরা বিশ্বস্ত) এবং আস-সাদেক (সেরা সত্যবাদী) উপাধি দিয়েছে, এমন এক বিরাট জনপ্রিয় ব্যক্তি যে বিপ্লবী ডাক দিয়েছেন তাতে জনগণের সাড়া দেবারই কথা। যদি সাড়া দিয়েই বসে তাহলে আর কারো নেতৃত্বই টিকবে না। নবী আল্লাহর হুকুম হিসাবে যা চালু করতে চাইবেন জনগণ যদি তা মেনে নেয় তাহলে তাঁরই নেতৃত্ব দেশে কায়েম হয়ে যাবে। তাই নিজেদের নেতৃত্ব বহাল রাখার জন্য সকল নেতা একজোট হয়ে নবীর বিরোধিতা করা জরুরী মনে করল।

এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে আবু জাহ্‌লরা নবীর দাওয়াতকে সঠিক ভাবেই বুঝতে পেরেছিল। তারা ঐ দাওয়াত কবুল করেনি বটে, কিন্তু ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। বুঝতে পারার কারণেই বিরোধিতা করা প্রয়োজন মনে করেছে।

তাহলে এ কথা বলা কি ভুল হবে যে আবু জাহ্‌ল কালেমার দাওয়াতকে যেমন বুঝেছিল মুসলমানদের মধ্যে কম লোকই তার মত বুঝে? মুসলিম জাতি নবীর দাওয়াতকে শুধু ধর্মীয় দাওয়াত মনে করার কারণেই আজ ইসলাম বিপন্ন। সারা বিশ্বে ৫ বার মসজিদ থেকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর আওয়ায উচ্চারিত হচ্ছে। মুসলিমরাই যদি এটাকে শুধু ধর্মীয় আহ্বান মনে করে তাহলে কাফির জাতিগুলোকে এর বিপ্লবী বাণী কারা শুনাবে? তাই কাফিরদের নিকট এ বিপ্লবী দাওয়াত পৌঁছে না।

নবীর দায়িত্ব কী?

নবী মানুষকে যে দাওয়াত দিয়েছেন তা শুধু ধর্মীয় দাওয়াত নয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে একমাত্র হুকুমকর্তা মনিব হিসাবে স্বীকার করার জন্যই দাওয়াত দিয়েছেন। যিনি এ ডাকে সাড়া দিতে রাযী হয়েছেন তিনিই ঘোষণা করেছেন ঃ

أَشْهَدُ أَنْ لَّاإِلٰهَ إِلَّااللّٰهُ.

অর্থাৎ "আমি সাক্ষ্য দিলাম যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন হুকুমকর্তা মনিব নেই।" যিনি এ ঘোষণা দিলেন তিনি বাস্তবে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিদ্রোহী হয়ে গেলেন এবং আল্লাহতায়ালা তাঁর রাসূলকে যে বিরাট দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন সে দায়িত্ব পালনের সাথী হয়ে গেলেন।

নবীর সে দায়িত্বটা কী? আল্লাহ তায়ালা গোটা বিশ্বের স্রষ্টা। প্রতিটি ছোট বড় সৃষ্টি তাঁর রচিত নিয়মেই চলছে। সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা, আকাশ-বাতাস, পাহাড়-পর্বত,

সাগর-উপসাগর, গাছ-পালা, নদীনালা, পশুপাখি, কীটপতংগ ইত্যাদি বাধ্য হয়ে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলছে বলে সূরা আলে ইমরানের ৮৩ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন। এ সব নিয়ম-কানুন নবীর মাধ্যমে পাঠানো হয়নি। আল্লাহ স্বয়ং সরাসরি এ সব তাঁর সৃষ্টির উপর জারী করেন।

কিন্তু মানুষের জীবন যাপনের জন্য যেসব বিধি-বিধান দরকার তা তিনি নবীর মাধ্যমে পাঠিয়ে তা মানব সমাজে জারী করার দায়িত্ব নবীর উপরই অর্পণ করেছেন। আল্লাহ ঐ সব নিয়ম-কানুন পালন করতে মানুষকে বাধ্য করেননি। মানুষ যদি তা মেনে চলে তাহলে দুনিয়ায়ও শান্তি পাবে, আখিরাতেও চিরকাল সুখে থাকবে। আর যদি না মানে তাহলে দুনিয়ায় অশান্তি ও বিশৃংখলা পোয়াবে এবং আখিরাতে চরম শাস্তি ভোগ করবে।

নবীর দায়িত্ব হল জনগণকে প্রথমে আল্লাহকে একমাত্র হুকুমকর্তা মনিব মানার দাওয়াত দেয়া। জনগণ যদি এ দাওয়াত কবুল করতে রাযী হয় তাহলে সমাজে শান্তি কায়েম হবে।

যারা নবীর ডাকে সাড়া দেন তাদেরকে নবী সংগঠিত করে আল্লাহর বিধান সমাজে কায়েমের জন্য প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দেন। এমন এক দল যোগাড় হলে এবং জনগণ নবীর বিরুদ্ধে সক্রিয় না থাকলে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম হয়। যেমন মদীনায় শেষ নবীর যুগে কায়েম হয়েছিল।

এভাবেই দেখা যায় যে মানব সমাজের জন্য আল্লাহ নবীর মাধ্যমে যে জীবন বিধান পাঠান তা আল্লাহ নিজে জারী করেন না। নবী নিজে এবং নবীর প্রতি যারা ঈমান আনেন তারাই আল্লাহর পক্ষ থেকে এ দায়িত্ব পালন করেন। এটাই খিলাফতের দায়িত্ব। আল্লাহর আইন তাঁর পক্ষ থেকে যারা জারী করেন তারাই আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলীফা।

নবীর বিরোধী কারা?

মানুষ যেখানেই বসবাস করে সেখানেই তাদেরকে নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। এ সব নিয়ম ও বিধি বিধান তারাই তৈরী করে যারা সমাজে নেতৃত্ব দেবার সুযোগ পায়। তারা এমন নিয়মই বানায় যাতে নেতাদের স্বার্থ ষোল আনা বহাল থাকে। তাই যখনই কোন নবী মানুষের মনগড়া আইনের বদলে শুধু আল্লাহর আইন মানবার দাওয়াত দেন তখন স্বাভাবিক কারণেই নেতাদের আঁতে ঘা লাগে। তখন তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য নবীর বিরোধিতা করা জরুরী মনে করে। যারা নবীর ডাকে সাড়া দেন তাদের উপর যুলুম-নির্যাতন চালায় যাতে অত্যাচারের ভয়ে মানুষ নবীর দাওয়াত কবুল না করে।

কিন্তু যারা আল্লাহর মহব্বতে এবং আখিরাতের সাফল্যের আশায় যুলুম-নির্যাতনের পরওয়া করেন না তারাই সাহস করে নবীর সংগঠনে শরীক হন।

সব নবীর যুগেই একইভাবে নেতারা বিরোধিতা করেছে এবং সাহসী লোকেরা নবীর দলে যোগদান করেছেন। শেষনবীর যুগে ১৩ বছর পর্যন্ত যুলুম নির্যাতন সহ্য করে যারা নবীর সংগে টিকে রইলেন তাদেরকে নিয়েই তিনি মদীনায় ইসলামী সরকার কায়েম করেন।

যারা নবীর বিরোধিতা করে তারা নবীর দাওয়াতের উদ্দেশ্য বুঝে বলেই তা করে। তারা বুঝতে পারে যে যদি জনগণ নবীর দাওয়াত কবুল করে তাহলে তদের মনগড়া আইনের বদলে আল্লাহর আইন চালু করা হবে এবং তাদেরকে নেতৃত্ব থেকে উৎখাত হতে হবে। তাদের স্বার্থ বহাল রাখার গরজেই তারা বিরোধিতা করে থাকে।

নবীর প্রতি ঈমানদারদের দায়িত্ব কী?

শেষ নবীর প্রতি সর্ব প্রথম তাঁর স্ত্রী হযরত খাদীজা (রাঃ) এবং বাল্যবন্ধু হযরত আবু বকর ঈমান আনেন। রাসূল (সাঃ) তাদেরকে প্রথম কী কাজের নির্দেশ দিলেন? তাদেরকে কি প্রথমেই নামায পড়তে এবং রোযা রাখতে বললেন? নবী তাদেরকে যে দাওয়াত দিলেন তাদেরকে অন্যদের নিকট সে দাওয়াত দেবার দায়িত্বই দিলেন। নবীর নিকট তারা যে শিক্ষা পেলেন তা অন্যদের নিকট পৌঁছাবার জন্যই তাদেরকে নির্দেশ দিলেন।

নবীর যে দায়িত্ব, নবীর প্রতি যারা ঈমান আনে তাদেরও একই দায়িত্ব। এ মহান দায়িত্ব পালনের সাথী হিসাবে যারা কাজ করলেন তারাই তাঁর সাহাবী। সাহাবী মানেই সাথী। ওহুদের যুদ্ধে যাবার দিন ফযরের নামাযে মদীনার মসজিদে রাসূল (সাঃ) এর ইমামতীতে এক হাজার লোক নামায আদায় করলেন। রাসূল (সাঃ) সবাইকে ওহুদের ময়দানে যাবার নির্দেশ দিলেন। কিছুদূর যাবার পর মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই-এর নেতৃত্বে ৩০০ লোক কাফেলা থেকে ফিরে এলো। নবীর আসল দায়িত্বে সাথী হতে তারা রাযী হল না। কুরআন তাদেরকে মুনাফিক ঘোষণা করল। এ দ্বারা এ কথাই প্রমাণ হল যে তারা নামায-রোযায় রাসূলের সাথী হওয়া সত্ত্বেও আসল কাজে সাথী না হওয়ায় সাহাবীর মর্যাদা পেল না।

আমাদেরকে সিরিয়াসলি বিবেচনা করতে হবে যে, নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাত আদায় করলেই কি নবীর প্রতি ঈমান আনার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়? মানুষের মনগড়া আইন ও নেতৃত্ব হলো শয়তানের রাজত্ব। শয়তানের রাজত্বের অধীনে নামায-রোযা করেই কি নবীর উম্মতের মর্যাদা বহাল রাখা যাবে?

বাতিল সমাজ-ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে এর অধীনে শুধু কতক ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করলেই কি নবীর প্রতি ঈমান আনার দায়িত্ব পালন হয়ে যায়? আল্লাহ মানুষের জন্য যে সব অধিকার বা হক নির্ধারিত করেছেন মানুষের মনগড়া আইনে তা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আল্লাহর আইন কায়েম করে মানুষের ঐ সব হক ভোগ করার সুযোগ দেবার জন্যই আল্লাহ পাক রসূল পাঠিয়েছিলেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন বলে সূরা আল-হাদীদের ২৫নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন। রাসূলের ঐ দায়িত্ব পালনে শরীক না হয়ে শুধু নামায রোযা করলেই ঈমানের দায়িত্ব পালন হওয়ার সার্টিফিকেট কোথায় পাওয়া গেল?

নামায-রোযা কাদের জন্য?

যে সঠিকভাবে ঈমান আনল তার মধ্যে প্রয়োজনীয় গুণাবলী সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই নামায-রোযা ফরয করা হয়েছে। ঈমান আনার অর্থ কী? নবী যে বিপ্লবী দাওয়াত দিলেন তা কবুল করার নামই ঈমান। একমাত্র আল্লাহকে হুকুমকর্তা মনিব বলে স্বীকার

করে নবীর দলে যোগদান করে শয়তানের খলীফাদেরকে উৎখাত করে আল্লাহর খিলাফত কায়েমের উদ্দেশ্যেই নবীগণ দাওয়াত দিয়েছেন। এ দাওয়াত যারা কবুল করে তারা আল্লাহর সৈনিক। সূরা আশ-শুয়ারায় এ সৈনিকদেরকেই নবীগণ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ

"আল্লাহকে ভয় কর, আর আমার আনুগত্য কর।" বলে আহ্বান জানিয়েছেন।

সূরা আল-আ'রাফ ও সূরা হূদে যে কয়জন নবীর নাম উল্লেখ করে একই ভাষায় বিপ্লবী দাওয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে নবীগণের নাম উল্লেখ করেই সূরা আশ-শুয়ারায় ৬ থেকে ৮ নং রুকুতে উপরোক্ত আহ্বানের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ আহ্বানের সুস্পষ্ট অর্থ হলো- "তোমরা দাওয়াত কবুল করে থাকলে আল্লাহকে ভয় করে চল এবং আমার সংগঠনভুক্ত হয়ে আমার আনুগত্য কর। অর্থাৎ আল্লাহর সৈনিক হিসাবে আমার সেনাবাহিনীতে শামিল হও।

এ জাতীয় সৈনিকদের জীবনকে গড়ে তুলবার জন্য যে সব গুণাবলী প্রয়োজন তা নামায ও রোযার মাধ্যমেই হাসিল করতে হবে। আল্লাহর সৈনিক হিসাবে যারা সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত তাদের জন্যই নামায-রোযার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারা একদিকে মানুষকে আল্লাহর রাজত্ব কায়েমের আন্দোলনে শরীক হবার দাওয়াত দিতে থাকবে এবং শয়তানের খলীফাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ময়দানে টিকে থাকবে। অপরদিকে সবর ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাইবে।

وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ (البقره : ١٥٣)

"ধৈর্য ও নামায দ্বারা আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও।" (সূরা আল বাকারাহ্ ১৫৩)। এ আয়াতটি কাদের জন্য? আল্লাহর সৈনিক হতে যারা প্রস্তুত নয় তাদের সাথে এ আয়াতের কী সম্পর্ক?

কালেমার বিপ্লবী দাওয়াত যারা বুঝে না এবং একটি মন্ত্র হিসাবে কালেমার যিক্র করে তাদের জীবনে নামায-রোযার মহান উদ্দেশ্য কেমন করে সফল হতে পারে? তাই দেখা যায় যে আল্লাহর সৈনিকের দায়িত্ব পালন না করে যারা নামায-রোযা করে তাদের জীবনে নামায-রোযা সুফল দেয় না।

আল্লাহ পাক নামাযের সুফল সম্বন্ধে বলেন,

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. (النكبوت : ٤٥)

" নিশ্চয়ই নামায অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।" (আনকাবুত ৪৫ আয়াত)। আল্লাহর এ কথা নিশ্চয়ই ভুল নয়। তাহলে নামায পড়া সত্ত্বেও নামাযের এ সুফল ফলে না কেন?

সূরা আল-বাকারার ১৮৩ আয়াতে রোযার সুফল সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ. (البقره : ١٨٣)

"আশা করা যায় যে তোমরা তাকওয়ার গুণ হাসিল করবে।"

আল্লাহর অপছন্দের কাজ থেকে নিজকে বাঁচিয়ে রাখার যোগ্যতাই হচ্ছে তাকওয়া। এ গুণ রোযাদারদের মধ্যে কি পাওয়া যায়? আল্লাহর কথা তো ভুল হতে পারে না। তাহলে এর সুফল কেন ফলে না?

এ সব প্রশ্নের জওয়াব তালাশ করতে গিয়েই আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে আল্লাহর সৈনিক না হলে সুফল ফলতে পারে না। যে কালেমা কবুলের উদ্দেশ্যই বুঝল না তাদের জীবনে নামায-রোযা শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান। তাই অনুষ্ঠানই পালন করা হচ্ছে। আল্লাহর সৈনিকের গুণাবলী তাদের নামায-রোযা দ্বারা তৈরী হয় না।

একটি বাস্তব উদাহরণ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার হেফাজতের জন্য সেনাবাহিনী রয়েছে। দেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে যারা সৈনিক হতে আগ্রহী তাদেরকে বিশেষভাবে যাচাই-বাছাই করে সেনা-বাহিনীতে ভর্তি করা হয়। ভর্তি করার পর তাদেরকে কঠোর ট্রেনিং দেয়া হয় যাতে দেশ রক্ষার দায়িত্ব পালনের যোগ্য হয়ে গড়ে উঠে। এ ট্রেনিং এত কষ্টকর যে কেউ কেউ সহ্য করতে না পেরে পালিয়েও যায়। যারা ট্রেনিং শেষ করে বাড়ীতে আসে তাদেরকে দেখে সহজে চেনাই যায় না। কারণ তারা ট্রেনিং-এর সময় এত কষ্ট সহ্য করে যে ফরসা ছেলেও কাল হয়ে যায় এবং বেশ শুকিয়ে হেংলা পাতলা হয়ে যায়।

এ ট্রেনিং তাদেরকেই দেয়া হয় যারা দেশ রক্ষার জন্য জীবন দিতে রাজী হয়ে সৈনিকের দায়িত্ব নিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যারা এ সিদ্ধান্ত নেয়নি তাদের জন্য এ জাতীয় ট্রেনিং অর্থহীন। এ ট্রেনিং সৈনিকদের মধ্যে ঐ সব গুণাবলী তৈরী করে যা দেশ রক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরী। সৈনিকদেরকে সকাল বিকাল বিউগ্যাল বাজিয়ে প্যারেড করার জন্য ময়দানে জমায়েত করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দেয়া হয়।

যারা সৈনিক জীবন গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়নি এমন একদল যুবককে যদি প্যারেড করাবার চেষ্টা করা হয় তাহলে এ দ্বারা কি সৈনিক সুলভ যোগ্যতা সৃষ্টি হবে? এটা নিতান্তই একটা খেলো কারবার বলে গণ্য হবে।

আল্লাহর সৈনিকদের ট্রেনিং দেবার জন্যই দৈনিক পাঁচবার মসজিদ থেকে আযান দেয়া হয়। দিনের ২৪ ঘন্টার রুটিন নামায দিয়ে শুরু করা হয়। সারাদিন আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী সব কাজ করার ট্রেনিং নামাযে দেয়া হয়। নামাযে রত থাকা অবস্থায় হাত-পা-চোখ-কান ও মনকে নিজের মরযী মত ব্যবহার করা যাবে না। রাসূল (সাঃ) যেভাবে নামায আদায় করা শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবেই সব অংগ প্রত্যঙ্গকে ব্যবহার করতে হবে। মুখে নিজের মরযী মত কোন কথা উচ্চারণ করা যাবে না। নামাযের বাইরেও আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী মুখ, দেহ ও মনকে ব্যবহার করার অভ্যাস নামাযের মধ্যে করান হয়। দুনিয়ার কাজ কর্মে লিপ্ত থাকার ফলে ঐ অভ্যাসটা ঢিলা হয়ে যায়। তাই বারবার নামাযে হাযির হয়ে ট্রেনিংটাকে ঝালাই করতে হয়। এভাবে নামায বাস্তব জীবনে কায়েম হয়।

নামায একথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে তুমি স্বাধীন নও, আল্লাহর দাস ও সৈনিক। তোমার খেয়াল খুশী মতো জীবন যাপন করলে আল্লাহর সৈনিক হিসাবে ব্যর্থ হবে। তুমি দুনিয়ার দায়িত্বও আল্লাহর সৈনিকের চেতনা নিয়ে পালন করবে। বেঁচে থাকার

প্রয়োজনে রুযি রোযগার করতে হবে এবং সংসারে ঝামেলা পোহাতে হবে। কিন্তু বেঁচে থাকবে বড় এক উদ্দেশ্যে-আল্লাহর রাজ্য কায়েমের জন্য। জীবনের এ বৃহত্তর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সজাগ থাকলেই আল্লাহর সৈনিকের দায়িত্ব পালনে অবহেলা হবে না। এ জাতীয় সৈনিকের জীবনেই নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাতের মহান উদ্দেশ্য আল্লাহ সফল করেন। তাদের জন্যই এ সব ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে আল্লাহর সৈনিক হবার সিদ্ধান্তই নিল না তার জীবনে এ সব নিছক কতক ধর্মীয় অনুষ্ঠান মাত্র। এ সবের ফসল তার জীবনে ফলতে পারে না।

আল্লাহ ও শয়তানের বাহিনী

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে খলীফার পজিশন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মনিব বা মালিকের মর্যাদা সে পেতে পারে না। তাই মানুষের ক্ষমতা ও ইখতিয়ার একেবারেই সীমাবদ্ধ। কোন কাজ করার ইচ্ছা ও চেষ্টার ক্ষমতাটুকুই শুধু মানুষকে দেয়া হয়েছে। কাজটি সম্পন্ন করা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ভাল বা মন্দ যে কাজের জন্যই ইচ্ছাকৃতভাবে চেষ্টা করা হয় এর ভাল বা মন্দ ফল আখিরাতে পাবে। পুরস্কার ও শাস্তি কাজটি সম্পন্ন হওয়ার উপর নির্ভর করে না। কারণ এর উপর মানুষের ইখতিয়ার নেই। এ সামান্য ইখতিয়ারটুকু নিয়ে মালিক হওয়া যায়না।

মানুষের জন্য আল্লাহ নবীর মাধ্যমে যে জীবন বিধান পাঠিয়েছেন সে বিধান নিজের ও সমাজের ওপর জারী করার জন্য যারা চেষ্টা করে তারাই আল্লাহর খলীফার মর্যাদা পায়। যারা এ বিধানকে অগ্রাহ্য করে নিজের বা অন্য কারো রচিত বিধান চালু করার চেষ্টা করে তারা শয়তানের খলীফা। মানুষকে খলীফাই হতে হবে। হয় আল্লাহর খলীফা হবে, না হলে শয়তানের। অন্য কিছু হবার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। স্রষ্টার সিদ্ধান্তই এ বিষয়ে চূড়ান্ত।

আল্লাহ তায়ালা সূরা আল বাকারার ২০৮ নং আয়াতে বলেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً، وَلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ.

"তোমাদের যারা ঈমান এনেছ, তোমরা (জীবন-বিধান হিসাবে) ইসলামের সবটুকু মেনে চল। শয়তানের পদরেখা অনুসরণ করো না।"

অর্থাৎ জীবনের যে এলাকায়ই তোমরা ইসলামের বিধান গ্রহণ করবে না, সে ক্ষেত্রে তোমরা অন্য যে বিধানই মেনে নাও তা অবশ্যই শয়তানের পথ। যদি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান না মান তাহলে অন্য বিধান মেনেই তোমাকে ব্যবসা করতে হবে। যদি দেশ শাসনের দায়িত্ব তোমাদের উপর আসে তাহলে আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ না করে অন্য যাদের পদ্ধতিই গ্রহণ করবে তাই শয়তানের পদাংক।

আল্লাহ তায়ালা সূরা মুজাদালার ১৯ ও ২২ আয়াতে দুটো বাহিনীর উল্লেখ করে বলেছেন যে শয়তানের বাহিনী আখিরাতে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আল্লাহর বাহিনীই সফল হবে। দুনিয়ায় এর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ নাও পেতে পেরে। সূরা আল মায়েদার ৫৬ আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ.

"যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এবং মুমিনদেরকে অভিভাবক, বন্ধু ও সাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করেছে (এ জাতীয় লোকেরা আল্লাহর বাহিনী) নিশ্চয়ই আল্লাহর বাহিনীই বিজয়ী।"

আল্লাহর বাহিনীর যোগ্যতা অর্জন করলে আল্লাহ তাদেরকে পরাজিত হতে দেন না। প্রয়োজন হলে ফেরেশতার বাহিনী দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করেন বলে কুরআনে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

ইতিহাস এ কথার জ্বলন্ত সাক্ষী যে অল্প সংখ্যক আল্লাহর বাহিনী বিরাট সংখ্যক দুশমনের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে। বর্তমানে সংখ্যায় মুসলমান শোয়াশ কোটি থেকে দেড়শ কোটি দাবী করা হয় বটে, কিন্তু এদের মধ্যে আল্লাহর সৈনিকের ভূমিকা কোথায়? নামায-রোযা পালনকারীর সংখ্যা খুব নগন্য নয়। তাদের মধ্যে আল্লাহর সৈনিকের চেতনা কয়জনের? কালেমার বিপ্লবী দাওয়াত তাদের কতজন কবুল করেছেন? যারা এ বিপ্লবী দাওয়াত সম্পর্কে সচেতন তারা সবাই কি সংগঠিত? "বুনিয়ানুম মারসূস" বা ইস্পাত কঠিন ঐক্যবদ্ধ বাহিনী হিসাবে কর্ম তৎপর হলে আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন বলে সূরা আস-সাফ্ এর ৯নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন। আর যারা আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার যোগ্য তারা কি ব্যর্থ হতে পারে?

আসুন আল্লাহর সৈনিক হই এবং আল্লাহর বাহিনী গড়ে তুলি

যারা নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাতের ধার ধারে না তাদের কথা বাদ দিলাম। আমরা যারা নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাত আদায় করি তাদের সংখ্যাও তো বিরাট। তারা যদি নবীগণের বিপ্লবী দাওয়াত কবুল করে আল্লাহর সৈনিক হবার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম হতে মোটেই বিলম্ব হতে পারে না।

আমাদের দেশে নবীগণের এ বিপ্লবী দাওয়াত সম্পর্কে সজাগ লোকের সংখ্যাও নগণ্য নয়। কিন্তু তারাও সবাই সংগঠিত অবস্থায় নেই। আসুন আমরা সবাই সংগঠিত হয়ে সকল নামাযী ও রোযাদারদেরকে আল্লাহর সৈনিক হবার আহ্বান জানাই। তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আসুন সবাই চেষ্টা করি। কালেমার বিপ্লবী চেতনা ছাড়া নামায-রোযা ইসলামের বিজয়ে কোন অবদান রাখতে পারে না।

আমরা কি ঐ কালেমা গ্রহণ করেছি যা সাহাবায়ে কেরাম কবুল করেছিলেন? মসজিদের মিনারগুলো থেকে যে কালেমা উচ্চারিত হচ্ছে এবং ঐ আযান শুনে মসজিদে জামায়াতে যে নামায আদায় করা হচ্ছে মদীনার মসজিদে সাহাবাগণ এমন নিষ্প্রাণ নামাযই পড়তেন?

এদেশে ইসলামের বিজয় কেন বিলম্বিত হচ্ছে? শয়তানের রাজত্ব দিন দিন কেন মযবুত হচ্ছে? আমরা যারা নামায-রোযা করি তাদেরকে কি আল্লাহর দরবারে এর জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে না?

আসুন আমরা যারা নামায-রোযা করি এখনই সিদ্ধান্ত নেই যে আমরা আল্লাহর সৈনিক হয়ে দায়িত্ব পালন করব। আর এ দায়িত্ব যেহেতু একা পালন করা সম্ভব নয়, সেহেতু সংগঠনভুক্ত হয়ে আল্লাহর বাহিনী গড়ে তুলব।

অধ্যাপক গোলাম আযমের রচিত বই-এর তালিকা

কুরআন

১. কুরআন বুঝা সহজ

২. আমপারা (তাফহীমুল কুরআনের সার-সংক্ষেপ)

৩. ২৯ পারা (তাফহীমুল কুরআনের সার সংক্ষেপ)

সীরাতুন্নবী

৪. সীরাতুন্নবী সংকলন

৫. নবী জীবনের আদর্শ

৬. ইসলামে নবীর মর্যাদা

৭. বিশ্ব নবীর চরিত্র গঠন পদ্ধতি

৮. বিশ্ব নবীর জীবনে রাজনীতি

৯. রাহমাতুললিল আলামীন।

ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন

১০. ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন

১১. ইকামাতে দ্বীন

১২. ইসলামী আন্দোলন-সাফল্য ও বিভ্রান্তি

১৩. বাইয়াতের হাকীকাত

১৪. রুকনিয়াতের দায়িত্ব ও মর্যাদা

১৫. ইসলামী আন্দোলনে কর্মীদের ৭ দফা

জামায়াতে ইসলামী

১৬. জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য

১৭. জামায়াতে ইসলামী ও বাংলাদেশ

১৮. গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী

১৯. অমুসলিম নাগরিক ও জামায়াতে ইসলামী

২০. বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও জামায়াতে ইসলামী

বাংলাদেশ

২১. আমার দেশ বাংলাদেশ

২২. বাংলাদেশের রাজনীতি

২৩. বাংলাদেশে আদর্শের লড়াই

২৪. পলাশী থেকে বাংলাদেশ

বিভিন্ন বিষয়

২৫. ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান

২৬. আধুনিক পরিবেশে ইসলাম

২৭. কিশোর মনে ভাবনা জাগে

২৮. ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ

২৯. মুসলিম মা বোনদের ভাবনার বিষয়

৩০. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ

৩১. A Guide To Islamic Movement

৩২. মনটাকে কাজ দিন

৩৩. মযবুত ঈমান

৩৪. আসুন আল্লাহর সৈনিক হই

৩৫. জীবন্ত নামায

৩৬. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সহীহ্ জযবা

৩৭. সৎ লোকের এত অভাব কেন?

৩৮. আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন

৩৯. নেতাদের এ দশা কেন?

৪০. কুরআনে ঘোষিত মুসলিম শাসকদের ৪ দফা কর্মসূচী